উত্তরভাষ

বাঙালীর নাট্য চেতনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হল । এই আলোচনা নিবদ্ধ ছিল আদি যুগ থেকে মধ্য - উনবিংশ শতাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও যাত্রায় নবযুগের সূচনা কাল পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘকালে বাঙালীর নাট্যচিন্তা কি ভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছে তার স্বরূপ সন্ধানই ছিল এই আলোচনার প্রধান লক্ষ্য । এই আলোচনায় আমরা অনুধাবন করলাম বাঙালীর নাট্যচিন্তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে , দেখলাম বিভিন্ন সময়ে এই নাট্যচিন্তার নানামুখী বিকাশকে , পরিচয় পেলাম এর অনন্য সাধারণ জীবনীশক্তির।

বাঙালী জাতি স্বভাবতঃই সঙ্গীত-প্রিয় ও নাট্যরসিক । সঙ্গীতকে সে নিবেশিত করেছে নৃত্যে , নৃত্যকে রূপায়িত করেছে ভাবাভিব্যঞ্জক অভিনয়ে। যে লোকাভিনয়ের ধারা আর্যাভিযানের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, বাংলাদেশও সেই ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত ছিল না । উপাদান - উপকরণের অপ্রতুলতা হেতু অতি প্রাচীনকালে বাঙালীর নাট্যচিন্তা ও নাট্যচর্চার স্বরূপ কেমন ছিল , তার আনুপূর্ব্ব পরিচয় না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ ও প্রাপ্ত উপাদানের অনুষঙ্গে প্রাচীন বাংলার নাট্যচিন্তার স্বরূপ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারা গিয়েছে । আমরা লক্ষ্য করেছি , জয়দেবের অনেক আগে থেকেই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল । সেই নাট্যাভিনয় সংস্কৃত নাট্যানুসারী ছিল না ।

বাঙালীর রসসংস্কারে নাট্যচর্চা ও নাট্যচেতনার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যরীতির খুব একটা সাদৃশ্য ছিল না । বাঙালী চিন্তা - চেতনার ক্ষেত্রে চিরকালই পল্লবগ্রাহিতা ও পরমুখাপেক্ষিতার বিরোধী এবং স্বাধীনতা প্রয়াসী । সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্রাগ্রসর-মনস্কতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল অবধি । নাট্য-চিন্তার ক্ষেত্রেও এই স্বাতন্ত্র্যবোধের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি । এই বোধ বাঙালীর বিশিষ্ট জাতীয় চেতনারই পরিচায়ক । খ্রীষ্টীয় অষ্টম - নবম শতাব্দী , হয়ত তারও অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছে এমন একটি স্বতন্ত্র নাট্যচেতনা, যার সঙ্গে সংস্কৃত দশরূপক রীতির সাদৃশ্য ছিল না । বাংলা দেশে যেকটি সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে , নাট্যাদর্শে সেগুলিও ছিল 'নাট্যশাস্ত্র'র চাইতে বাংলাদেশে প্রচলিত লোকনাট্যাদর্শেরই অনুগামী । বাঙালীর এই বিশিষ্ট নাট্যরীতিই একসময়

নেপালসহ মধ্য উত্তর-পূর্বভারতের নাট্যাদর্শ রূপে পরিগৃহীত হয়ে এর গৌরববৃদ্ধি করেছে। এই নাট্যরীতি থেকেই কালক্রমে বিকশিত হয়েছিল বাংলা যাত্রা। এই বিষয়টি যাথাযথ অভিনিবেশের অভাবে এতকাল অলক্ষিতই থেকে গিয়েছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রচলিত লোকনাট্যের রীতিই অবলম্বিত হয়েছে। নৃত্য-গীতাত্মক লোকাভিনয়ের এই রীতিই 'নাটগীত' রূপে পরিচিত ছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলাদেশের নাটগীতের এই আদর্শই গীত গোবিন্দের মাধ্যমে বাহিত হয়ে মিথিলা হয়ে নেপালে পৌঁছেছিল। নেপালের সঙ্গীত নাটকগুলির মধ্যে বাংলা নাটগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। অসমের শঙ্করদেব বাংলা নাটগীতের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

শ্রী চৈতন্যদেবের নৃত্য-গীতাভিনয়টিও ছিল মূলতঃ নাটগীত। যাত্রার উদ্ভব হয়েছে চৈতন্যোত্তর কালে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের দ্বারা। শ্রীচৈতন্যদেবের পর থেকেই নাটগীত দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। একটি ধারা কৃষ্ণলীলাত্মক যাত্রায় বিকশিত হয় এবং অপরধারাটি লোকনাট্যরূপে সাধারণ বাঙালী সমাজে প্রচলিত থাকে। লোক সাধারণ যাত্রার দার্শনিকতা, মার্জিত রুচিতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেনি বরং তথাকথিত স্থূল ও আদিরসাত্মক, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রস্তুত লোকনাট্য ধরনের নৃত্য-গীতাত্মক অভিনয়েই তাদের শৈল্পিক রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার নাট্যরসোজ্জ্বল পালাগুলি আমাদের এই ধারণাকেই সমর্থন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত লোকনাট্যগুলির প্রসঙ্গও এই সূত্রে বিবেচ্য।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত যাত্রা একইভাবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছয় নি। যাত্রা-দেহেও পড়েছে নানা প্রভাবের আস্তরণ। ঘটেছে সংস্কার ক্রিয়া, যাত্রার উৎকর্ষ নিয়ে যাত্রাকার-অধিকারিগণ করেছেন নানা চিন্তাভাবনা। যাত্রার বিষয়বস্তু রূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ। নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়েও যাত্রা লুপ্ত হয় নি। পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ রফা করে, বহিঃপ্রভাবকে আত্মস্থ করে যাত্রা শেষ পর্যন্ত কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী বলে এবং মুসলমান শাসকগণের বিরোধীতা ও অসহযোগিতার ফলে বাঙালীর নাট্যচর্চা গতিরুদ্ধ হয়েছে - এ ধারণা যে যথার্থ

নয় , বাঙালীর নাট্যচর্চা ও নাট্যচিন্তার নিরবচ্ছিন্নতাই তার স্পষ্ট প্রমাণ ।জাতি হিসেবে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই ছিল সঙ্গীত-প্রিয় ও নাট্যরসিক । কিন্তু যেহেতু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতি ছিল প্রধানতঃ হিন্দু - ধর্মাশ্রিত তাই মুসলমানদের ভূমিকা এ ব্যাপারে ছিল কিছুটা গৌণ । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-চর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তাতে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমানগণের আগ্রহই প্রমাণিত হয় । তাছাড়া মৈমনসিংহ , শ্রীহট্ট , নোয়াখালি , চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে লৌকিক বিষয়াশ্রিত লোকনাট্য ধরনের গীতিকাগুলির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই সংশ্রব ছিল । ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যচর্চায় মীর মুশাররফ হোসেনের মত মুসলমান নাট্যকারের ভূমিকাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত বহুবিচিত্র গীতিধারায় বাঙালী যুগপৎ উপভোগ করেছে গীতিরস ও নাট্যরস । খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত বিভিন্ন গীতিধারার অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা বিশ্লেষণের সূত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা শুধু নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেই চরিতার্থ হয় নি , বিচিত্রভাবে গীতিধারার মধ্য দিয়েও তা চরিতার্থ হয়েছে ।

সব শিষ্ট সংস্কৃতির মূল যে আদি লোক সংস্কৃতি তার সম্পর্কে শিষ্ট সমাজের কৌতূহল খুবই কম । ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের উৎসমূলে রয়েছে যে লোকনাট্যের ঐতিহ্য সে সম্পর্কেও খুব কমই অনুসন্ধান হয়েছে । লোক-সমাজ কোনদিনই শিষ্ট নাটকের পক্ষপাতী ছিল না । তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে নৃত্য-গীতাত্মক নাট্যাভিনয়ে রূপায়িত করেছে । কখনও কখনও পৌরাণিক প্রসঙ্গও তারা তাদের মত করে রূপায়িত করেছে নৃত্য-গীতাত্মক নাট্যাভিনয়ে । এই লোকনাট্যের ধারা আজও অনবলুপ্ত । সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা রূপে এই লোকনাট্য চর্চিত হয়ে আসছে । লোকনাট্য প্রসঙ্গে আলোচনায় এই লোকনাট্যের অসাধারণ সঞ্জীবনী শক্তি ও জন মনোরঞ্জনের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আমরা লক্ষ্য করেছি ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা বাঙালীর নাট্যরসরুচিরই এক অভিনব প্রকাশ । একসময় শ্রীচৈতন্যদেবের সাত্ত্বিকী অভিনয়ের আদর্শেই যেমন যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল , উনিশ শতকের নবশিক্ষিত

বাঙালীর নাট্যরসরুচিও যেমনি প্রচলিত যাত্রায় পরিতৃপ্তির উপায় খুঁজে না পেয়ে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের অনুরাগী হয়েছিল। নবশিক্ষিত বাঙালীর এই নবনাট্যানুরাগ কোন অন্যান্য নিরপেক্ষ প্রবণতা নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালীর এই প্রবণতা ঐতিহ্যানুগত নাট্যরসসংস্কারেরই নতুন অভিব্যক্তি। নতুন এই নাট্যরসরুচির মধ্যে ঐতিহ্যের যোগবন্ধন না হলেও বাঙালী তার অন্তর্গত রুচি-সংস্কারকে একেবারে বিস্মৃত হতে পারে নি। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকে অনুসরণ করে আধুনিক নাটকের বিকাশ হলেও যাত্রা তথা দেশীয় নাট্যরীতিকেও সে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারে নি। এই দ্বৈধ বাংলা নাটক কোনদিনই পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

নাট্যরসিক বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা তিনটি ধারায় পরিতৃপ্ত হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত লোকনাট্যের ধারা, দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের সময় থেকে লোকনাট্যসম্ভূত নাটগীতির ধারা, ষোড়শ শতাব্দীতে নাটগীতি থেকে বিবর্তিত যাত্রার ধারা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক নাটকের ধারা। লোকনাট্য, যাত্রা ও নাটক - এই ত্রিমুখী ধারা একে অপরের দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত হলেও তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে আজও সমবেগে প্রবহমান। রবীন্দ্র নাথ অসামান্য প্রতিভাবলে এই তিনটি ধারাকেই সমন্বিত করেছিলেন তাঁর নাটকে।

বাঙালীর নাট্যচেতনার ধারা উনিশ শতকে এসেই থেমে যায় নি। বরং তা আরও ব্যাপক ও বহুমুখী হয়েছে। যাত্রা, নাটক এমনকি লোকনাট্যেরও উৎকর্ষ বিধানে কলাকার-নাট্যকারগণ নানা চিন্তা ভাবনা করেছেন, প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়ে নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন। এই চিন্তা-ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুবৃত্তি আজও চলছে।